Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 52
Website: https://tirj.org.in, Page No. 395 - 405
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 395 - 405
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের চিন্তাধারার একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

অনন্যা সরকার
গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: ananyasarkar70@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Rabindranath, Vivekananda, Nation, Nationalism, Violence, Universality, Human Unity, Self - Power, Development.

Abstract
In Indian history advent of two Eminent person Rabindranath & Vivekananda were at same regime. Among them one was earthly minded and another was Self Sacrificing monk. On the basis of their spirit of life & practice in the utmost it may seem to be reverse in thought.

Thorough their lifestyle & sense of value apparently contrast but on the ground of their thought and consciousness it deep down at nearby location. Both Personality entitled to versatile talent. Rabindranath & Vivekananda both were not specifically connect with direct politics. But visually omni directional dimension in their line of thought on Nationalism seen and heard through their various speech, composition and discussion which inspired countrymen.

Both of them thought for the development of the country in order to improve people's lives. Any type of narrowness ever Appear in their thought.

Wariness manifestation is not possible except absolute power wakefulness. When wariness will come among the people, Nationalism will happen.

Thorough their thought directed towards countrymen in favour of welfare but at least it spread along universe.

Discussion

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব। কেবল ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে এই মনীষীদ্বয় ছিলেন মানবতা ও প্রগতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ। সংকীর্ণতামুক্ত মানবমুক্তি সুনিশ্চিত করার এক অনন্য পথপ্রদর্শক। প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থেকেও তাঁদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিষয় সম্পর্কে অভিমতের পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। এখানের আলোচ্য বিষয় হল জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের চিন্তাধারার তুলনামূলক আলোচনা ও বিশ্লেষণ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) চলাকালীন সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান সফরে যান। এই সফরকালে দুই দেশে যুদ্ধকালীন উদ্ভূত ভয়ংকর তান্ডবের পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তিনি যুদ্ধের জন্য পশ্চিমের উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতাকে দায়ী করে যে সকল বক্তৃতা করেন সেগুলিকে সংকলিত করেই তাঁর 'Nationalism' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এছাড়া তাঁর 'আত্মশক্তি', 'কালান্তর', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি রচনাতেও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত চিন্তাধারার উল্লেখ আমরা পেয়ে থাকি।

বিবেকানন্দ কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব না হওয়ার কারণে জাতীয়তাবাদকে রাজনীতির আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করেননি ১৮৯৩ সালে চিকাগো বিশ্বধর্ম মহা সম্মেলন উপলক্ষ্যে আমেরিকায় পদার্পণ করা থেকে ১৮৯৮ সালে ভারত প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত ইংল্যান্ড ও আমেরিকার অনেক মানুষের সাথে পরিচিত হন ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেন আবার ১৮৯৭ সালে ভারত প্রত্যাবর্তনের পর পরিব্রাজক রূপে ভারত ভ্রমণের ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নানা ভাষা বর্ণ ও শ্রেনির মানুষদের সাথে পরিচালকের অভিজ্ঞতা তার জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। 'Lectures from Colombo to Almora', 'East and West', 'Modern India' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং তাঁর নানা বক্তৃতা, রচনা ও আলোচনার মধ্য দিয়ে তা উদ্ভাসিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে এর কয়েকটি দিক সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

জাতীয়তাবাদের অর্থ :

আমরা জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলির মধ্যে 'জাতি' শব্দটির পরিবর্তে 'নেশন'(Nation) শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করে থাকি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন –

> "স্বীকার করিতে হইবে, বাঙলায় 'নেশন' কথার প্রতিশব্দ নাই। চলিত ভাষায় সাধারণত জাতি বলিতে বর্ণ বুঝায় এবং জাতি বলিতে ইংরেজিতে 'রেস' শব্দে প্রতিশব্দরূপেই ব্যবহার করিব এবং নেশনকে নেশনই বলিব। নেশন ও ন্যাশনাল শব্দ বাঙলায় চলিয়া গেলে অনেক অর্থ দ্বৈধ - ভাবদ্বৈধের হাত এড়ানো যায়।"[১]

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে অখণ্ড মানবপ্রেম। পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদী ভাবনায় যে সংকীর্ণতার চিত্র ফুটে উঠেছে তার সঙ্গে ভারতীয় ভাবধারার তিনি তুলনা করেছেন। সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের বর্ণনানুসারে,

> "যে সমাজচিত্রপটে ইউরোপে জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি ও প্রসার ঘটেছিল, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সেই পটভূমিকায় জন্মায়নি। উভয়ের উদ্ভব, পরিবেশ ও কারণগুলি ছিল ভিন্ন। ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ পুঁজিবাদের সম্প্রসারণ, বিশ্বব্যাপী বাজারদখল, পররাজ্যগ্রাস ও শোষণের তাগিদে উদ্ভূত হয়। ...অপরের স্বাধিকার খর্ব করে নিজের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী।"[২]

পশ্চিমী জাতীয়তাবাদে যেভাবে পরজাতিবিদ্বেষ ও সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তাকে তিনি কোনদিন সমর্থন জানাতে পারেননি। তাঁর 'ন্যাশনালিজম' গ্রন্থে তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন—

> "For the sake of humanity, we must stand up and give warning to all that Nationalism is a cruel epidemic of evil that is sweeping over the human world of the present age eating into its moral vitality."[৩]

স্বদেশের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আবেগ অনুরাগ কোন অংশে কম ছিল না। দেশ বলতে তিনি কোন ভৌগোলিক সীমাকে মনে স্থান দেননি। সমগ্র বিশ্বই ছিল তাঁর দেশ ও বিচরণক্ষেত্র। সমগ্র মানবসমাজ তাঁর চোখে এক ও অখণ্ড। এই কারণে তিনি বিশেষ কোনো দেশের সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের ধারণাকে সমর্থন করতে পারেননি।

তাঁর 'Nationalism' গ্রন্থ হতে জানা যায় পাশ্চাত্যের জ্ঞান ও গবেষণার প্রতি তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সেখানকার সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার আদর্শে তিনি প্রভাবিত হন। তবে তিনি অনুভব করেন যে রুশো, বার্ক প্রমুখ দার্শনিকদের প্রভাব হতে ইউরোপ ক্রমশ সরে আসছে। রাজনৈতিক আধিপত্যবিস্তার হয়ে উঠেছে মুখ্য ও মানবিক আদর্শ ও সমবেদনা

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 52
Website: https://tirj.org.in, Page No. 395 - 405
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হয়ে উঠেছে গৌণ। আফ্রো-এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলির শোষণ ও নিপীড়নে মানবতা ও সভ্যতার উপর চরম বিপদ ঘনিয়ে আসে। পাশ্চাত্যের এই দানবীয় আচরণকে অনুসরণের জন্য রবীন্দ্রনাথ জাপানের নিন্দা করেছেন।[৪]

আবার বিবেকানন্দের চিন্তার মধ্যে 'জাতীয়তা' এবং 'জাতিগঠনের যুগ' এরূপ কোনপ্রকার শব্দসমূহ পাওয়া যায় না। তাঁর অনুগামীদের মতে,

> "He neither use the word 'Nationality' nor proclaimed an era of Nation - Making; Man-Making he said was his main task."[৫]

স্বামীজি এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন যে মানুষের সত্তার বিকাশ ছাড়া একটি জাতিও প্রকৃতভাবে গড়ে উঠতে পারে না। যার ফলে জাতীয়তাবাদও তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলে। এরূপ ধারণা থেকে মনুষ্যত্বের বিকাশের দিকটি তাঁর কাছে প্রাধান্য পায় এবং সেটাই হয়ে ওঠে 'মানুষ তৈরির দর্শন'। মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করা এবং তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া— এই দুটো বিষয় মনুষ্যত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মনে করেছেন। বিশিষ্ট গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মতে —

> "তিনি প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ চান, তাই প্রত্যেক ব্যক্তি নমুনাকে জাতি ধরেছেন এবং সেই সমাজব্যবস্থা চেয়েছেন যার মধ্যে ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনা থাকে।"[৬]

ড: ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন—

> "স্বামীজি ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বলতে যা বুঝতেন তার অন্তর্নিহিত অর্থ আজকের দিনের থেকে ছিল পৃথক। তাঁর কাছে জাতির অর্থই জনসাধারণ। তিনি জনগণের উন্নতি ও নৈতিক স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ভারতীয় জনগণের অর্থনৈতিক ও নৈতিক উন্নতি। 'জন্মসাধারণ' বলতে তিনি কোন রাজনৈতিক শব্দ বোঝেননি। তিনি বুঝতেন ভারতবর্ষের অধিবাসীদের সুবৃহৎ যে-অংশ সেই জনগণ।"[৭]

স্বামীজির জাতীয়তাবাদের প্রধান উপাদান তাঁর অতুলনীয় মানবপ্রেম। জাতির জনগণের স্বার্থে দেশবাসী চরিত্রে যে গুণগুলির উন্মেষ অপরিহার্য বলে তিনি মনে করতেন সেগুলি হল - আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরশীলতা, নৈতিক ও শারীরিক বল। তাই তিনি বলেছিলেন –

> "আমি চাই এমন লোক যাদের পেশিসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাত নির্মিত, আর তার মধ্যে থাকবে এমন একটি মন, যা বজ্রের উপাদানে গঠিত।"[৮]

ইতিহাসের পর্যালোচনা :

ভারতের ইতিহাসের গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে স্বামীজি উপলব্ধি করেছিলেন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি কোন একটি বিশেষ নরগোষ্ঠী, ধর্মসম্প্রদায় বা সামাজিক শ্রেনির একক প্রচেষ্টা দ্বারা সৃষ্ট হয়নি বা এর জন্য কোন একটি শ্রেনি, সম্প্রদায় বা বর্ণের লোক বিশেষ গৌরব দাবি করতে পারে না। তিনি বলেন –

> "সত্যিই ভারতবর্ষ এক নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা। ... নেগ্রিটো, কোলারীয়, দ্রাবিড় এবং আর্য প্রভৃতি ঐতিহাসিক যুগের নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র উপস্থিত। এদের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাতার, মঙ্গোলবংশীয়গণ এবং ভাষাতাত্ত্বিকদের তথাকথিত নানা আর্য শাখা-প্রশাখা মিলিত। পারসিক, গ্রীক, ইয়ুচি, হুন, চীন, সীথিয়ান - অসংখ্য জাতি মিলিত মিশ্রিত। ইহুদী, আরব, মঙ্গোলীয় থেকে আরম্ভ করে স্ক্যান্ডিনেভীয় জলদস্যু ও জার্মান বনচারী দস্যুদল অবধি, যারা এখনও একাত্ম হয়ে যায়নি - এই সব বিভিন্ন জাতির তরঙ্গায়িত বিপুল মানবসমুদ্র - যুধ্যমান, স্পন্দমান, চেতনায়মান, নিরন্তর পরিবর্তনশীল - ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে নিম্নে ছড়িয়ে পড়ে ক্ষুদ্র জাতিগুলিকে আত্মসাৎ করে আবার শান্ত হচ্ছে। ভারতবর্ষের এ-ই হল ইতিহাস।"[৯]

তিনি আরও বলেন যে,

> "আমাদের দৃঢ় ধারণা কোন ব্যক্তি বা জাতি অপর সম্প্রদায়ের মানুষের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রেখে বাঁচতে পারে না, যখনই কোন জাতি নিজেদের শ্রেষ্ঠতাবোধ, নীতিবোধ বা পবিত্রতাবোধের ভ্রান্ত অভিমান থেকে তেমন চেষ্টা করেছে, তখনই বিচ্ছিন্নতাকামী জাতির পক্ষে তার ফল মারাত্মক হয়েছে।"[১০]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে ইতিহাসের আদিকাল হতে ভারতভূমি বহু জাতি ও বহু মানুষের মিলনস্থল। তিনি বলেছেন-

> "হিন্দু সভ্যতা যে অত্যাশ্চর্য্য প্রকাণ্ড সমাজ বাঁধিয়াছে, তাহার মধ্যে স্থান পায় নাই এমন জাত নাই। প্রাচীন শকজাতীয়, জাঠ ও রাজপুত, মিশ্রজাতীয় নেপালী, আসামী, রাজবংশী, দ্রাবিড়ী, তৈলঙ্গী, নায়ার - সকলে আপন ভাষা, বর্ণ, ধর্ম্ম ও আচারের মধ্যে প্রভেদ সত্ত্বেও সুবিশাল হিন্দুসমাজের একটি বৃহৎ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া একত্রে বাস করিতেছে। হিন্দু সভ্যতা এত বিচিত্র লোককে আশ্রয় দিতে গিয়া নিজেকে নানা প্রকারে বঞ্চিত করিয়াছে, কিন্তু তবুও কাহাকেও পরিত্যাগ করে নাই — উচ্চ, নীচ, সবর্ণ, অসবর্ণ সকলকেই ঘণিষ্ঠ করিয়া বাঁধিয়াছে, সকলকে ধর্ম্মের আশ্রয় দিয়াছে, সকলকে কর্ত্তব্যপথে সংযত করিয়া শৈথিল্য ও অধঃপতন হইতে টানিয়া রাখিয়াছে।"[১১]

স্বজাতির প্রতি নিবিড় অনুভূতি থাকা সত্ত্বেও সে আকর্ষণ কোনোভাবেই বিশ্বজনীন মানবতাবোধের আদর্শের পরিপন্থী হয়নি বরং পরিপূরক হিসেবে পরিলক্ষিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় –

> "যে সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিতভাবে লাভ করতে পারে সে সত্যটি কী, সে সত্য প্রধানত বণিগ্‌ বৃত্তি নয়, স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়; সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা।"[১২]

এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনার সাথে বিবেকানন্দের চিন্তাভাবনার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর ভাষায় –

> "The Universal Sympathy, Universal love, Universal bliss, that never changes raises man above everything."[১৩]

বিশ্বজনীন ঐক্যের উপাসনায় বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু এক হওয়া বলতে কখনোই তাঁরা একাকার হওয়ার কথা বলতে চাননি। যারা বিচ্ছিন্ন তারা পরস্পরের বিশিষ্টতাকে স্বীকার করে নিয়ে তবে সত্যস্বরূপে সম্মিলিত হতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের জাতীয় জনজীবনের কেন্দ্র হিসেবে ধর্মজীবনের কথা উল্লেখ করেন। ধর্মকে জাতীয় জীবনের প্রাণশক্তি হিসেবে উল্লেখ করলেও ধর্ম সম্পর্কে কোন কুসংস্কার বা সংকীর্ণতাকে তিনি তাঁর চিন্তায় স্থান দেননি। তিনি বলেন-

> "হিন্দু যেন কখনও তার ধর্মত্যাগ না করে। তবে ধর্মকে তার নির্দিষ্ট সীমার ভিতর রাখতে হবে। আর সমাজকে উন্নতির স্বাধীনতা দিতে হবে। ভারতের সব সংস্কারকই এই মহাভুল করেছেন যে পৌরহিত্যের সব রকম অত্যাচার ও অবনতির জন্য তাঁরা ধর্মকেই দায়ী করেছেন এবং ধর্ম অবিনশ্বর দুর্গকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেছেন। ফল কি হয়েছে? ব্যর্থতা।"[১৪]

ভারতীয় জীবনে ধর্মের স্থান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অভিমত হল-

> "বস্তুত প্রত্যেক সভ্যতারই একটি মূল আশ্রয় আছে। সেই আশ্রয়টি ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত কি না, তাহাই বিচার্য্য। যদি তাহা উদার ব্যাপক না হয়, যদি তাহা ধর্ম্মকে পীড়িত করিয়া বর্দ্ধিত হয়, তবে তাহার আপাতত উন্নতি দেখিয়া আমরা তাহাকে যেন ঈর্ষা ও তাহাকেই একমাত্র ঈপ্সিত বলিয়া বরন না করি। ...আমাদের হিন্দুসভ্যতার মূলে সমাজ, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি। ...কিন্তু আমরা যদি মনে করি, য়ুরোপীয় ছাঁদে নেশন গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য, তবে আমরা ভুল বুঝিব।"[১৫]

ভারতের অবনতির কারণ :

রবীন্দ্রনাথ ভারতের অবনতির কারণ হিসেবে মানুষের অন্তর্নিহিত সারবত্তার অবক্ষয়কে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে "বাইরে থেকে যতই সংস্কারসাধনের প্রচেষ্টা করা হোক না কেন মানুষ অন্তর থেকে যতক্ষণ না বিকশিত হচ্ছে, আত্মোপলব্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত একটু আধটু সংস্কারের মাধ্যমে কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়-

> "মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ফলশ্রুতিতেই সমাজ তথা দেশের অবনতি। মনের সংকীর্ণতা দূর করে সমগ্রের উন্নতিসাধনের প্রয়োজনে কৃতসংকল্প হওয়া প্রয়োজন।"[১৬]

বিবেকানন্দ একথা উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতের জনগণের এক বৃহৎ অংশ নির্বিত্ত অবস্থায় জীবনধারণ করছে, এদের জীবনযাত্রার মান যতক্ষণ না উন্নত হচ্ছে ততক্ষণ দেশের উন্নতি কোনরূপেই সম্ভব নয়। তাঁর ভাষায়–

> "আমার মনে হয় দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাই হল আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ। যতদিন ভারতের সর্বসাধারণ ভালোভাবে শিক্ষিত হচ্ছে, ভালোভাবে খেতে পাচ্ছে, অভিজাত লোকেরা যতদিন না তাদের ভালোভাবে যত্ন নিচ্ছে ততদিন যতই রাজনৈতিক আন্দোলন করা হোক না

> কেন কোন কিছুতেই কিছু হবে না… ভারকে যদি পুনরুদ্ধার করতে হয় আমাদের অবশ্যই তাদের জন্য কাজ করতে হবে।”[১৭]

অভিজাত শ্রেণির দ্বারা দরিদ্র জনগণের শোষণের ব্যবস্থাকে স্বামীজী তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। ড: ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায়-

> “যাঁরা জনতাকে পদদলিত রাখতে যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছেন তাঁদের বক্তব্যকে তিনি (স্বামীজী) 'দানবীয় ও বর্বর' আখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ‘দেশপ্রেমিক হবার প্রথম সোপান হল ক্ষুধার্ত জনগণের প্রতি সহমর্মিতা’।”[১৮]

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য হল-

> “আজ আমাদের দেশে অনেক শিক্ষিত লোকে দেশের কাজ করিবার জন্য আগ্রহবোধ করেন। কোন্ কাজটা বিশেষ দরকারি এ প্রশ্ন প্রায়ই শোনা যায়। অনেকে সেবা করিয়া, উপবাসীকে অন্ন দিয়া, দরিদ্রকে ভিক্ষা দিয়া, দেশের কাজ করিতে চান। গ্রাম জুড়িয়া যখন আগুন লাগিয়াছে তখন ফুঁ দিয়া আগুন নেভাবার চেষ্টা যেমনি ইহাও তেমনি। আমাদের দুঃখের লক্ষণগুলি বাহির হইতে দূর করা যাইবে না, দুঃখের কারণগুলি ভিতর হইত দূর করিতে হইবে।”[১৯]

ভারতের পুনরুত্থানের উপায় :

অধিকাংশ লোক যখন দেশের বাইরের কাঠামোটির উপর গুরুত্ব আরোপ করে বহির্বিকৃতিকেই যথাসর্বস্ব মনে করে, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ তখন স্বদেশের বাহ্য বিকৃতির মূলে নিহিত দেশবাসীর অন্তরের বিভ্রান্তি ও মোহগ্রস্থতা সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করে তুলতে চেয়েছিলেন। ব্যষ্টি অপেক্ষা সমষ্টির কল্যাণই জীবন - একথা উভয়ই বলেছেন।

বিবেকানন্দ দেখেছিলেন যে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ দারিদ্রতার শিকার হয়েছে, অন্ন, বস্ত্র, আত্মমর্যাদার অভাববোধের দরুণ নিজেদের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। এর সাথে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, রোগ-মহামারীতে দেশ স্থবির হয়ে পড়েছে। তিনি উপলব্ধি করেন যে ভারতের জাতীয় পাপ হল তার জনসাধারণকে অবজ্ঞা করা। এই পাপের ফলেই দেশ দুর্বল। বারবার বিদেশি শক্তির দ্বারা পদানত হচ্ছে। জনসাধারণের বৃহত্তম অংশ খেটে খাওয়া মানুষ। তাদের প্রতি অবহেলা চিরদিন চলতে পারে না। এর পরিবর্তন ঘটলেই ভারত জাগবে। এর জন্য পরস্পরের মধ্যে বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তবেই ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধের জাগরণ ঘটবে। তিনি বলেছেন-

> “হে ভারত, ভুলিও না … নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন করো; সদর্পে বলো… আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বলো মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই… ।”[২০]

স্বামীজি যুবসমাজের কাছে প্রত্যাশা করেছেন দেশগঠনের কাজে এগিয়ে আসার বিষয়ে। স্বামীজী তাদের বলেছেন ‘জন্ম থেকেই তুমি মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত’। ভারতের অগণিত আর্ত নরনারীর সেবাই হল মুখ্য বিষয়। দরিদ্রের কুটিরে কুটিরে গিয়ে তরুণেরা ‘শিবজ্ঞানে জীবসেবা’ করে আসবে। সেবা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা দিয়ে দেশকে জাগাতে হবে।

বিবেকানন্দ জাতীয়তাবাদের যে আধ্যাত্মিক রূপ দর্শিয়েছেন তার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র, বিপিনচন্দ্র, শ্রী অরবিন্দের চিন্তার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের মত বিবেকানন্দের হৃদয়পটেও মাতৃরূপে দেশের চিত্র কল্পিত হয়। তিনি বলেছিলেন-

> “আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম জননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন, অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েকবর্ষ ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন, এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত… তোমার স্বজাতি… সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন।”[২১]

মাতৃভূমি প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাবোধ কোন অংশে কম ছিল না। তিনি অসংখ্য দেশাত্মবোধক সংগীত রচনা করেছেন। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি ইংরেজ প্রদত্ত ‘নাইট’ উপাধি ত্যাগ করেছিলেন। দেশের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন–

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 52
Website: https://tirj.org.in, Page No. 395 - 405
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "বাহিরের দিক হইতে স্বাধীনতা পাওয়া যায় এমন ভুল যদি মনে আঁকড়িয়া ধরি তবে বড়ো দুঃখের মধ্যেই সে ভুল ভাঙ্গিবে। ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি নাই বলিয়াই অন্তরে বাহিরে আমাদের বন্ধন। ...আপনার দেশকে আমরা অতি সামান্যই দিতেছি, সেই জন্যই আপনার দেশকে পাই নাই।"[২২]

মুক্তির সাধনায় অন্তরঙ্গের অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা দিকটি রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছেন। দেশজুড়ে যে দারিদ্রতা দেখা দিয়েছে তার মূলে আছে প্রধানত দেশবাসীর অন্তরের নিঃস্বতা। সেই নিঃস্বতাকে দূর করতে হবে এবং চিত্তের সৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে দেশকে সংগঠিত করতে হবে। তিনি বলেন-

> "যেহেতু মানুষের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে তার আত্মশক্তিসম্পন্ন অন্তর-প্রকৃতিতে, এই জন্য যে দেশকে মানুষ আপনার জ্ঞান, বুদ্ধিতে, প্রেমে, কর্মে সৃষ্টি করে তোলে সেই দেশই তাঁর স্বদেশ।"[২৩]

তিনি মনে করেছেন যে দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সম্পদ ও সুযোগ সুবিধার উপস্থিতির পথ প্রশস্ত করা। তিনি পল্লীসমাজের উন্নয়নের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর 'সমবায়নীতি' রচনায় উল্লেখ করেছেন যে,

> "বর্তমানকালের মানুষের জন্য বিদ্যা, স্বাস্থ্য, জীবিকানির্বাহের জন্য যে সকল সুযোগ সৃষ্টি করেছে সেগুলি যাতে অধিকাংশের পক্ষে দুর্লভ না হয়, সর্বসাধারণের হাতে এমন উপায় থাকা চাই। কোনোমতে খেয়ে-পড়ে টিকে থাকতে পারে এইটুকু মাত্র ব্যবস্থা কোন মানুষের পক্ষেই শ্রেয় নয়, তাতে তার অপমান।"[২৪]

গণজাগরণের ভিত্তি হিসেবে জনশিক্ষার গুরুত্বের কথা রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ উভয়েই স্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন –

> "দেশকে মুক্তি দিতে গেলে দেশকে শিক্ষা দিতে হবে।"[২৫]

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'Our Duty to The Masses' প্রবন্ধে বলেছেন -

> "The only service to be done for our lower classes is to give them education, to develop their lost individuality."[২৬]

বিবেকানন্দ মনে করতেন দেশের কাজের জন্য কেবলমাত্র পুরুষ হলেই চলবে না, নারীদেরও প্রয়োজন। গুরুভাইদের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছিলেন–

> "মেয়ে-মদ্দ দুই চাই... হাজার হাজার পুরুষ চাই, স্ত্রী চাই... যারা আগুনের মতো হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী—উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়বে।"[২৭]

রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও নারীজাগরণের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। জাতীয় জাগরণের জন্য নারীর আত্মশক্তি জাগরণের প্রয়োজনীয়তাকে তিনি উপলব্ধি করেন। তিনি বলেছেন-

> "আমাদের দেশের আধুনিক মেয়েদের মন ঘরের সমাজ ছাড়িয়ে প্রতিদিন বিশ্বসমাজে উত্তীর্ণ হচ্ছে। ...আমার মনে হয় পৃথিবীতে নতুন যুগ এসেছে। ...একা পুরুষের গড়া সভ্যতায় যে ভারসামঞ্জস্যের অভাব প্রায়ই প্রলয় বাঁধাবার লক্ষণ আনে, আজ আশা করা যায় ক্রমে সে যাবে সাম্যের দিকে।"[২৮]

বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে দেশের বৈষয়িক উন্নতি ঘটাতে চেয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যুবকরা কারিগরিবিদ্যা শিখে দেশে কলকারখানা গড়ে তুলুক। তাতে কর্মসংস্থান হবে। তিনি বলেন–

> "একবার চোখ খুলে দেখ, স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে অন্নের জন্য কি হাহাকারটা উঠেছে! তোদের ওই শিক্ষায় সে অভাব পূর্ণ হবে কি? কখনও নয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান- সহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর – চাকুরি-গুখুরি করে নয় - নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান- সহায়ে নিত্যনতুন পন্থা আবিষ্কার করে। ...অন্নবস্ত্রভাবে চিন্তায় চিন্তায় দেশ উৎসন্ন হয়ে গেছে – তা তোরা কি করছিস? ফেলে দে তোর স্বাস্থ্য-ফাস্ত্র গঙ্গাজলে। দেশের লোকগুলোকে আগে অন্নস্থান করার উপায় শিখিয়ে দে, তারপর ভাগবত পড়ে শোনাস। কর্মতৎপরতা দ্বারা ঐহিক অভাব দূর না হলে ধর্ম-কথায় কেউ কান দেবে না।"[২৯]

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন ভারতের পুনরুত্থানের জন্য মানসিক গতিশীলতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তিনি বলেন –

> "নতুন অবস্থা, নূতন শিক্ষা, নূতন জাতির সহিত সংঘর্ষ— ইহাকে অস্বীকার করা যায় না। আমরা যদি এমনভাবে চলিতে ইচ্ছা করি, যেন ইহারা নাই, যেন আমরা তিন সহস্র বৎসর পূর্বে বসিয়া আছি, তবে সেই তিনসহস্র বৎসর পূর্ব্বকার অবস্থা আমাদিগকে কিছুমাত্র সাহায্য করিবে না এবং বর্ত্তমান পরিবর্তনের বন্যা আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। ...আমাদের ভাবসূত্রটি রক্ষা করিয়া সচেতন ভাবে এক কালের সহিত আর এক কালকে মিলাইয়া লও, নহিলে সূত্র আপনি ছিন্ন হইয়া যাইবে।"[৩০]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা :

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের নানা উক্তি ও রচনায় বারংবার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজের মেলবন্ধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রাচ্য শাস্ত্রাচারমুখী স্থিতিসর্বস্ব এবং পাশ্চাত্য বস্তুবিজ্ঞানমুখী গতিসর্বস্ব। এই স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্যবিধানের প্রয়োজনে, সমাজ ও আদর্শ বিশ্বগঠনের জন্য পূর্ব ও পশ্চিমকে সম্মিলিত করার কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন –

> "আদান-প্রদানই প্রকৃতির নিয়ম, ভারতকে যদি আবার উঠতে হয়, তবে তাকে নিজের ঐশ্বর্যভান্ডার উন্মুক্ত করে দিয়ে পৃথিবীর সব জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং বিনিময়ে অপরে যা কিছু দেয় তাই গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সম্প্রসারণই জীবন – সংকীর্ণতাই মৃত্যু।"[৩১]

স্বামীজীর এই বক্তব্যের সাথে রবীন্দ্রনাথের চিন্তারও সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলেন—

> "পূর্ব ও পশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে উভয়েই ব্যর্থ হবে; ...পূর্ব পশ্চিমকে মিলতে হবে। এই মিলনের অভাবে পূর্বদেশ দৈন্যপীড়িত, সে নির্জীব; আর পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ; সে নিরানন্দ।"[৩২]

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই মনে করতেন যে প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের একটা আপন সত্তা আছে, নিজস্ব একটা ভাব আছে। একই ভাবে বিশ্বের প্রতিটি জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমন্ডিত একটি ভাবধারা আছে, একটি উদ্দেশ্য আছে, যা জাতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। বিবেকানন্দের ভাষায়-

> "প্রত্যেক জাতির একটা জাতীয় উদ্দেশ্য আছে। প্রাকৃতিক নিয়মাধীন বা মহাপুরুষদের প্রতিভাবলে প্রত্যেক জাতির সামাজিক রীতিনীতি সেই উদ্দেশ্যটি সফল করবার উপযোগী হয়ে গড়ে যাচ্ছে। ...কিন্তু যদি আসল উদ্দেশ্যে ঘা পড়ে তখুনি সে জাতি নাশ হয়ে যাবে। ...তিনটি বর্তমান জাতির তুলনা কর, যাদের ইতিহাস তোমরা অল্পবিস্তর জানো ...ফরাসি, ইংরেজ হিন্দু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসি জাতির চরিত্রের মেরুদন্ড ...ইংরেজ চরিত্রের ব্যবসা-বুদ্ধি, আদান-প্রদান প্রধান; যথাভাগ ন্যায়বিচার ইংরেজদের আসল কথা ...হিন্দু বলছেন কি'যে রাজনৈতিক সামাজিক স্বাধীনতা ...বেশ কথা; কিন্তু আসল জিনিস হচ্ছে পারমার্থিক স্বাধীনতা ... 'মুক্তি' এটি জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য।"[৩৩]

এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত অভিমত হল –

> "ইংরেজদের ছেলে জানে, তাহার বাপ-পিতামহ অনেক যুদ্ধজয়, দেশ-অধিকার ও বাণিজ্যব্যবসা করিয়াছে, সেও নিজেকে রণগৌরব, ধনগৌরব, রাজ্য গৌরবের অধিকারী করিতে চায়। আমরা জানি, আমাদের পিতামহগণ দেশ অধিকার ও বাণিজ্য- বিস্তার করেন নাই। ...ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।"[৩৪]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলনের প্রয়োজনীয়তার উপর বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব আরোপ করলেও এই সম্মিলনের নামে প্রাচ্য কর্তৃক পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণকে তাঁরা কখনোই সমর্থন জানাননি। এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেন –

> "আমাদের অন্যান্য জাতের কাছে অনেক শেখার আছে। ... 'যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি', তবে দেখো জিনিসটা আমাদের ঢঙে ফেলে দিতে হবে, এইমাত্র। আর আসলটা বাঁচিয়ে বাকি জিনিস শিখতে হবে।"[৩৫]

পাশ্চাত্যের অনুকরণে দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য যাতে আমরা বিস্মিত না হই সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন-

> "নেশন শব্দ আমাদের ভাষায় নাই, আমাদের দেশে ছিল না। ...আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ, কিছুই নেশনগঠনের প্রাধান্য স্বীকার করে না। য়ুরোপ স্বাধীনতাকে যে স্থান দেয়, আমরা

> মুক্তিকে সেই স্থান দিই। ...আমাদের গৃহস্থের কর্ত্তব্যের মধ্যে সমগ্র জগতের প্রতি কর্তব্য জড়িত রহিয়াছে। আমরা গৃহের মধ্যেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডপতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।"[৩৬]

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ এঁনারা কেউ প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না কিন্তু জাতির জ্বলন্ত সমস্যাগুলি তাঁদের দৃষ্টির অগোচার হয়নি। রবীন্দ্রনাথের চোখে জাতির চেয়ে মানুষই ছিল বড়। তিনি পৃথক পৃথক জাতিভিত্তিক দেশপ্রেমের পরিবর্তে বিশ্বজনীন মানবপ্রেমের উদার প্রেক্ষাপটে নিজের চিন্তাধারা বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়াসী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব তাঁর কর্ম ও সিদ্ধান্তকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে। যে অন্ধ উত্তেজনা মানুষের মধ্যে হিংসাত্মক, আক্রমনাত্মক, বিদ্বেষমূলক মনোভাবের জন্ম দেয় তাকে তিনি স্বীকার করেননি। এই কারণে তিনি পশ্চিমের উগ্র জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করেননি। আবার স্বদেশের মুক্তিসাধনায় সন্ত্রাসবাদ বা কোনরকম হিংসাত্মক পন্থাকেও সমর্থন করেননি। ব্যক্তিগত ভাবে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও তাঁর চিন্তাধারা বা অনুসৃত পন্থাকে সর্বদা সমর্থন করতে পারেননি। তিনি গান্ধীজীর চরকা আন্দোলনকে সমালোচনা করেন। আবার গান্ধীজি ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সপক্ষে অহিংস আন্দোলন শুরু করলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমালোচনা করেন। ১৯২১-২২ সালে বিদেশী বস্ত্র পোড়ানোর বহ্ন্যুৎসবকে বিদেশের প্রতি ঘৃণা উজ্জীবিত করবে বলে মনে করে রবীন্দ্রনাথ তার বিরোধিতা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেন যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতিসাধন করতে হলে, তাদের মধ্যে সচেতনতার বিকাশ ঘটাতে গেলে, প্রয়োজনীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবিকা সংস্থানের বন্দোবস্ত প্রয়োজন। এভাবে সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে পারলে জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটবে। তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে ভারতবাসীকে জনগণের প্রতি সেবাধর্মের দ্বারা ভ্রাতৃত্ববোধে আবদ্ধ একটি সুদৃঢ়, সংঘবদ্ধ, ঐক্যবদ্ধ, অখণ্ড ভারত গঠন করতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন দেশকে মাতৃরূপে ভক্তি ও সেবা করলে একদিন দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচন ঘটবে। তাঁর এই আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদের ধারণা পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কর্মী ও বিপ্লবীদের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানে অনুপ্রাণিত করেছিল। ড: ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা থেকে জানা যায় তিনি ভগিনী ক্রিস্টিনকে ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে অবগত করতে বলেছেন-

> "বিদেশী শাসন উচ্ছেদ করবার জন্য আমি ভারতীয় নৃপতিদের নিয়ে একটি শক্তিজোট গঠন করতে চেয়েছিলাম। সেজন্যই আমি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। সেই জন্যই আমি বন্দুক নির্মাতা স্যার হাইরাম ম্যাক্সিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলাম। কিন্তু দেশের কাছে আমি কোন সাড়া পাইনি, দেশটা মৃত! ...তিনি আরও বলেন ...ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গে আজ পচন ধরেছে। আমি চাই একদল নিঃস্বার্থ তরুণ কর্মী যারা জনগণকে শিক্ষা দিয়ে উন্নত করে তুলবে।"[৩৭]

তিনি উপলব্ধি করেন যে সমাজ ও ধর্মসংস্কারের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন সাধিত হবে না। এর জন্য প্রয়োজন মানুষের আন্তরিক সচেতনতার জাগরণ। স্বামীজীর মত রবীন্দ্রনাথও মনে করতেন বাহ্য বিপর্যয়ের মূলে থাকে অন্তরের বিভেদ। বাইরে থেকে কোন প্রলেপ দিয়ে সেই ক্ষত সারানো সম্ভব নয়। একমাত্র আন্তরিক ঐক্যই সকল অসঙ্গতিকে দূর করতে পারে। বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ উভয়ই মনে করতেন জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়ের পশ্চাতে রয়েছে প্রকৃত মানুষ। সে মানুষ বিশ্বজনীন। বিবেকানন্দ ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজদের আগ্রাসনের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও ইংরেজ জাতি তথা পাশ্চাত্যের ইতিবাচক দিকগুলি গ্রহণ করার কথা বলেছেন। অনুরূপে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমের উগ্র জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করা সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল দিকগুলির প্রশংসা করেছেন এবং উভয়য়েই পূর্ব ও পশ্চিমের সম্মিলন কামনা করেছেন। তবে কখনোই অন্ধভাবে পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করে নিজ দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, নৈতিকতাকে বর্জন করার কথা বলেননি। তবে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পাশ্চাত্যের সদর্থক দিকগুলি গ্রহনের কথা বলেছেন। পরিশেষে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের আবির্ভাব প্রায় একই সময়ে ঘটলেও উভয়ের তিরোধানের কালগত ব্যবধান অনেকখানি। বিবেকানন্দ জীবিত ছিলেন (১৮৬৩-১৯০২)। রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর আরো ৩৯ বছর জীবিত ছিলেন। দীর্ঘ জীবনলাভের ফলস্বরূপ কালের অগ্রগতি ও বয়সের পরিণতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা ও কর্মক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হয়েছিল। যেগুলি তাঁর বিভিন্ন রচনা, বক্তৃতা ও আলোচনার মধ্যে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 52
Website: https://tirj.org.in, Page No. 395 - 405
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিবেকানন্দ তাঁর স্বল্পস্থায়ী জীবনে ততখানি সময় পাননি। তা সত্ত্বেও লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে কালের পরিপ্রেক্ষিতে ও সময়ের অনুপাতে বিবেকানন্দের চিন্তার অগ্রগতি ও বিস্তার ছিল অসামান্য ও অভূতপূর্ব।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, আত্মশক্তি, কলকাতা, মজুমদার লাইব্রেরী, ১৩১২, পৃ. ১১৮
২. গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন, বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, জি.এ.ই. পাবলিশার্স, ১৯৬৮, পৃ. ৯৯
৩. Tagore, Rabindranath. *Nationalism,* New Delhi, Sristi Publishers & Distributors, First Edition 2021. P. 58
৪. Ibid. 70
৫. *Vivekananda: The Man and His Message, By His Eastern & Western Disciples,* Calcutta, Advaita Ashrama, Second Edition 1995. P. 9-10
৬. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (তৃতীয় খন্ড), কলকাতা, মন্ডল বুক হাউস, ১৩৮৫, পৃ. ৪৭৯
৭. দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, কলকাতা, নবভারত পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৪০০, পৃ. ১
৮. স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (সপ্তম খণ্ড), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, দ্বাদশ পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৩৩৫
৯. স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (পঞ্চম খণ্ড), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, পঞ্চদশ পুনর্মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৩ পৃ. ২৯৪
১০. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (তৃতীয় খন্ড), কলকাতা, মন্ডল বুক হাউস, ১৩৮৫, পৃ. ১২১
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, আত্মশক্তি, কলকাতা, মজুমদার লাইব্রেরী, ১৩১২, পৃ. ১০
১২. মজুমদার, আদিত্যপ্রসাদ, চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ, কলকাতা, শ্রী ভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৭৪, পৃ. ১৮৯
১৩. *The Complete Works of Swami Vivekananda* (Vol-II). Calcutta, Advaita Ashrama, 1960. P. 413
১৪. স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, চতুর্দশ পুনর্মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০০২, পৃ. ৩০১
১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ভারতবর্ষ, কলকাতা, মজুমদার লাইব্রেরী, ১৩১২, পৃ. ৮২
১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সমবায়নীতি, বিশ্বভারতী, ১৯৬০, পৃ. ১২-১৩
১৭. স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (নবম খণ্ড), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ত্রয়োদশ পুনর্মুদ্রণ, আগস্ট ২০০২, পৃ. ৩০৬-৩০৭
১৮. দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, কলকাতা, নবভারত পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৪০০, পৃ. ৮
১৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সমবায়নীতি, বিশ্বভারতী, ১৯৬০, পৃ. ১৩
২০. স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, চতুর্দশ পুনর্মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০০২, পৃ. ১৯৪
২১. স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (পঞ্চম খণ্ড), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, পঞ্চদশ পুনর্মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০০৩, পৃ. ২৪৩
২২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, কালান্তর, বিশ্বভারতী, নূতন সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৭৬, পৃ. ১২০

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 52
Website: https://tirj.org.in, Page No. 395 - 405
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩
২৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সমবায়নীতি, বিশ্বভারতী, ১৯৬০, পৃ. ২৫০
২৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, কালান্তর, বিশ্বভারতী, নূতন সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৭৬, পৃ. ২৫০
২৬. *The Complete Works of Swami Vivekananda* (Vol-IV), Calcutta, Advaita Ashrama, 1955. P. 415
২৭. স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (নবম খণ্ড), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ত্রয়োদশ পুনর্মুদ্রণ, আগস্ট, ২০০২, পৃ. ৫৯
২৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, কালান্তর, বিশ্বভারতী, নূতন সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৭৬, পৃ. ৩৬৮
২৯. স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (নবম খণ্ড), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ত্রয়োদশ পুনর্মুদ্রণ, আগস্ট, ২০০২, পৃ. ১৬৪-১৬৫
৩০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, আত্মশক্তি, কলকাতা, মজুমদার লাইব্রেরী, ১৩১২, পৃ. ১৫
৩১. স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (সপ্তম খণ্ড), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, দ্বাদশ পুনর্মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ২৫৪
৩২. মজুমদার, আদিত্যপ্রসাদ, চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ, কলকাতা, শ্রী ভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৭৪, পৃ. ১৪৭
৩৩. স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, চতুর্দশ পুনর্মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ২০০২, পৃ. ১৪
৩৪. মজুমদার, আদিত্যপ্রসাদ, চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ, কলকাতা, শ্রী ভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৭৪, পৃ. ১৮৯ ৩৫. স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, চতুর্দশ পুনর্মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০০২, পৃ. ২৬
৩৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ভারতবর্ষ, কলকাতা, মজুমদার লাইব্রেরী, ১৩১২, পৃ. ৮০-৮১
৩৭. দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, কলকাতা, নবভারত পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৪০০, পৃ. ২

Bibliography:

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, আত্মশক্তি, কলকাতা, মজুমদার লাইব্রেরী, ১৩১২
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সমবায়নীতি, বিশ্বভারতী, ১৯৬০
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ভারতবর্ষ, কলকাতা, মজুমদার লাইব্রেরী, ১৩১২
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, কালান্তর, বিশ্বভারতী ,নূতন সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৭৬
Tagore, Rabindranath. *Nationalism,* New Delhi, Sristi Publishers & Distributors, First Edition 2021.
স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (পঞ্চম খণ্ড), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, পঞ্চদশ পুনর্মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০০৩
স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, চতুর্দশ পুনর্মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০০২
স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (সপ্তম খণ্ড), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, দ্বাদশ পুনর্মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০০১
স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা (নবম খণ্ড), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ত্রয়োদশ পুনর্মুদ্রণ, আগস্ট ২০০২
The Complete Works of Swami Vivekananda (Vol-II). Calcutta, Advaita Ashrama, 1960.
The Complete Works of Swami Vivekananda (Vol-IV). Calcutta, Advaita Ashrama, 1955.
Vivekananda: The Man and His Message, By His Eastern & Western Disciples, Calcutta, Advaita Ashrama, Second Edition 1995

দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, কলকাতা, নবভারত পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৪০০

বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (তৃতীয় খন্ড), কলকাতা, মন্ডল বুক হাউস, ১৩৮৫

মজুমদার, আদিত্যপ্রসাদ, চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ, কলকাতা, শ্রী ভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৭৪

দত্ত, জ্যোতির্ভূষণ, সময়ের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ, কলকাতা, পুনশ্চ, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৩

মুখোপাধ্যায়, জীবন, স্বামী বিবেকানন্দ ও যুবসমাজ, কলকাতা, ওরিয়েন্ট বুক এম্পোরিয়াম, প্রথম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ ১৩৭২